হে বন্ধু বিদায় ...

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

বিশে মার্চ, ২০০৮ এর সকাল। অফিসে এসে ই-মেইল খুলতেই একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম। ঢাকা থেকে আমার চুয়াল্লিশ বছরের পুরোনো সহপাঠী বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার কুতুবুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছে আগের দিন সকাল এগারোটায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দুজনেরই সহপাঠী, ঘনিষ্ট বন্ধু আয়েনুল হক ইন্তেকাল করেছে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। সাতক্ষীরার ছেলে আয়েনুল প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে আমেরিকার অধিবাসী। মাস খানেক আগে ও ঢাকা এসেছিল আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য। চার দিন পর, অর্থাৎ ২৩ শে মার্চ তার আমেরিকা ফেরৎ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই নিয়তি তাকে অনন্ত যাত্রায় নিয়ে গেল। 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে?/ আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,/ তার নিমন্ত্রন লোকে লোকে;/নব নব পূর্বাচলে, আলোকে আলোকে।' সত্যি তো জীবনেরে কে রাখিতে পারে? কেউ না। পবিত্র কালামে পাকের সুরা আল ইমরানের ১৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সোবহানা ওয়া তা'য়ালা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেন ✓ওয়া মা কানা লি নাফসেন আন তামুতা ইল্লা বিইজনিল লাহে কিতাবাম মুয়াজ্জালা - অর্থাৎ, কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট ভাবে লিখা রয়েছে।

ঢাকায় এসে আয়েনুল ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার ছয় নম্বর সড়কে তার শ্যালকের বাসায় অবস্থান করছিল। উনিশে মার্চ সকাল দশটার দিকে সে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করে এবং তার শ্যালককে এম্বুলেন্স ডাকতে বলে। সঙ্গে সঙ্গেই বাসার কাছাকাছি অবস্থিত ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের এম্বুলেন্স ডাকা হয়। কিন্তু একজন হৃদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সেই অক্সিজেনই এম্বুলেন্সটিতে ছিলনা! পথে আয়েনুলের প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, কিন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে সে কষ্ট দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। হাসপাতালে যখন সে পৌঁছোয় তখনো নাকি তার হৃদস্পন্দন ছিল, তবে তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীন। হাসপাতালের কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের জরুরী চিকিৎসা বিভাগে তাকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য নেওয়া হলেও তাতে আর তার কোন উপকার হয়নি। কিছুক্ষন পর ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। তাকে গোসল দিয়ে, শ্বেত শুভ্র কাফনের কাপড়ে অন্তিম সাজে তার লাশকে এখন সাজিয়ে বারডেম এর হিমঘরে রাখা হয়েছে। আমেরিকা প্রবাসী তার স্ত্রী-পুত্র, পুত্রবধু, ভাই, বোনদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। তারা এলে লাশ দাফন করা হবে।

আয়েনুলের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৩ সালে; যতদুর মনে পড়ে মে মাসে ইষ্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারীং এন্ড টেকনোলজির প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সময়। ভর্তি হওয়ার পর আমরা দুজনেই প্রথমে পলাশী ব্যরাকের টিনশেড হোস্টেল ও পরে কায়েদে-আজম হলে (এখনকার তিতুমীর হল) পাশাপাশি রুমের বাসিন্দা হই। তারপর সুদীর্ঘ ছাত্র জীবন আমাদের একসংগে কেটেছে; দু'জনেই মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং পড়েছি এবং ধীরে ধীরে একে অপরের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়েছি। আমার বাড়ী যেহেতু নারায়ণগঞ্জে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্বল্পকালীন অর্থাৎ দু'একদিনের ছুটি-ছাটায় আয়েনুল আমাদের বাড়ীতে এসে ছুটি কাটিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ার তৃতীয় বর্ষে ও আমাদের কয়েকজন সহপাঠীকে সুন্দরবন বেড়াতে নিয়ে গেছে। ওর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর পুরোনো সে সব অনেক স্মৃতিই মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে।

১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আয়েনুল হক আমেরিকায় চলে যায়। যাবার আগের দিন হঠাৎ করে নিউ-মার্কেটা ওর সাথে দেখা। ব্যস্ততা থাকা সত্বেও আমাদের দেড় বছরের মেয়ে সোনিয়াকে দেখার জন্য ও ইলেফেন্ট রোডে আমাদের তৎকালীন বাসায় এসেছিল । তারপর বহু বছর ওর সাথে আমার আর কোন যোগাযোগ ছিলনা, শুধু জানতাম ও জেনারেল মোটরস এ চাকুরী করে। প্রায় পনেরো বছর পর, যতটুকু মনে পড়ে ১৯৮৬ সালের শেষদিকে ঢাকা থেকে আমেরিকা ফেরার পথে ও সিংগাপুরের চাঙ্গী বিমান বন্দর থেকে আমার সিংগাপুরের বাসায় ফোন করে। এর পর ওর সাথে আমার অনিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তবে

যোগাযোগটা নিয়মিত হয় ১৯৯৬ এ মিশিগান স্টেটের মিডল্যান্ড শহরে সদ্য চাকুরী নিয়ে আসা আমাদের মেয়ে ও জামাই এর কল্যানে। চাকুরী সংক্রান্ত কাজে আয়েনুলকে তখন প্রায়ই মিডল্যান্ডের পাশের শহর মাউন্ট প্লিজেন্টে আসতে হতো। সেখানে তার কোন বন্ধুর বাসায় সে কেমন করে আবিস্কার করে সোনিয়া আমার মেয়ে। তারপর থেকে আমার মেয়ে ও জামাই আয়েনুলের ও আদরের মানুষ হয়ে যায়। গত নভেম্বর মাসে আমি যখন আমেরিকায় সোনিয়াদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি, তখন বেশ কয়েকবারই আয়েনুলের সাথে আমার দেখা হয়েছে। থ্যাঙ্কসগিভিং এর ছুটিতে সোনিয়া একদিন আয়েনুল সহ আমার তিন-চারজন পুরোনা বন্ধুকে সপরিবারে নিমন্ত্রন করে। এদের মধ্যে ছিল খন্দকার আজিজ, আবদুর রাজ্জাক, ও সাইদ হাসান। জমজমাট আড্ডার মাঝখানে অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের সারাটা দিন কেটে যায়। আজ এই লিখাটি লিখতে গিয়ে সে দিনটির কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আয়েনুলের সাথে আমার শেষ কথা হয়। ও বলেছিল মার্চে ও ঢাকা যাবে এবং এ বছরের শেষে সিডনীতে আমার বাসায় বেড়াতে আসবে। এখন আমি নিশ্চিত জানি, আয়নুল হক আর কোথাও যাবে না; তার শেষ গন্তব্যে সে চলে গেছে। আমাদের খুকু ভাবী, আয়েনুলের দীর্ঘদিনের প্রিয় সহধর্মিনী ঢাকায় এসে তাকে চিরদিনের মতো শুইয়ে দিয়ে ফিরে যাবেন ডেট্রয়েট মহানগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ব্লুমফিলডে তাদের ছায়াঘেরা বাসায়। তাকে আর ভাবতে হবেনা তার ভোজনবিলাসী স্বামীটি ডায়েবিটিস বা ব্লাডপেশারের ঔষধটা ঠিকমতো খেল কিনা। যেখানে সে গেছে, সেখানে ঔষধের কোন প্রয়োজন হয়না।

আর আমরা, আয়েনুল হকের বন্ধুরা যারা বেঁচে আছি, তারা শুধু বলবো ‘হে বন্ধু বিদায়। তুমি যেখানে গেছ, সেখানে শান্তিতে থাক। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তোমার আত্মাকে চির শান্তিময় আবাস বেহেশতে স্থান দিন।’

(১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাদের অনেকেরই আয়েনুল হককে চিনতে পারার কথা। সে খুব ভাল ক্রীড়াবিদ ছিল এবং যতদুর মনে পড়ে একবার বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু হয়েছিল।)

সিডনী, মার্চ ২০, ২০০৮